History and Heritage, Journal of the Department of Islamic History and Culture, University of Dhaka
ISSN: 3008-1653; Vol. 01, December, 2024; DoI: 10.70775/HnH/V010010

বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি
(Islamic Attitude Towards Ecological Conservation)

নাজমা*

Abstract:

Islam is a complete code of Life. All aspects of human life are highlighted in Islam with great significance. It includes ecology and the utmost importance has been given to ecology and its conservation, protection and rehabilitation. It also emphasized on the importance of preserving ecological components and protecting natural resources. Ecology is the interactions of humans, the natural environment and other living and non-living (biotic, abiotic and physical) organisms. It is dependent on interaction with humans and natural elements like sunlight, soil, air, water and vegetation etc. About five hundred verses have been revealed in the Holy Quran on ecological components. Among these about two hundred verses are related to animals. Six surahs are named after cattle and creatures. Through this, Almighty Allah informed us about the importance of ecological conservation. The Holy Prophet (PBUH) has laid special momentous on the proper use, protection and maintenance of various elements and components of Ecology. The United Nations (UN) declared the decade 2011-2020 as the "UN Decade on Bio-diversity" and the decade 2021-2030 as the "UN Decade on Ecosystem". The United Nations also set a target to achieve the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030. Among these Three goals such as goal 13 (Climate Action), goal 14 (Life below Water) and goal 15 (Life on Earth) of the SDGs are related to Ecological conservation. However in Islam, about 14 centuries ago, specific and clear instructions have been given for the conservation, protection and maintenance of ecology. This article is a humble endeavour to present an analytical review of Islamic attitude towards Ecological Conservation. The article also explores the importance of Ecological conservation, protection, sustainable utilization and development of natural resources on the light of Islam.

মূল শব্দ: ইসলাম, বাস্তুসংস্থান, পরিবেশ, উদ্ভিদকূল, প্রাণিকূল, জীব-বৈচিত্র্য।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও শাশ্বত জীবন বিধান। মানুষের কল্যাণের জন্য পৃথিবীর সকল কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে।[১] বাস্তুসংস্থানও এর ব্যতিক্রম নয়। বাস্তুসংস্থান ব্যতীত জীব ও প্রাণির জীবন ধারণ সম্ভব নয়। মানুষ পশুপাখি, জীবজন্তু, প্রাকৃতিক নানা উপকরণ যেমন গাছপালা, মাটি, সূর্যালোক, পানি, বায়ু প্রভৃতি পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ বেঁচে থাকার তাগিদে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের জীব সম্প্রদায় ও জড় পরিবেশের সাথে নিবিড় আন্ত:সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জীব সম্প্রদায়ের সাথে জড় পরিবেশের এই নিবিড় আন্ত:সম্পর্ককেই বলা হয় বাস্তুসংস্থান। জীব মাত্রই পরিবেশ থেকে তার প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণ করে এবং তা পুনরায় সম্পূর্ণরূপে পরিবেশকে ফিরিয়ে দেয়। ফলে জীব ও জড় পরিবেশ একে অন্যের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এই প্রভাব কখনো ইতিবাচক, কখনো নেতিবাচক আবার কখনো তা জীবন বিপন্নকারী হতে পারে। মহান আল্লাহ্ মহাবিশ্বের সকল কিছু ভারসাম্যপূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন। তাই পারস্পরিক নির্ভরশীল উপাদানসমূহের কোন একটির ব্যাঘাত ঘটলে বাস্তুসংস্থানের বিপর্যয় ঘটতে পারে। এই জন্য বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণে ইসলামে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ৬টি সূরার নামকরণ করা হয়েছে বিভিন্ন গবাদি পশু এবং জীবজন্তুর নামে। তাছাড়া বাস্তুসংস্থানের বিভিন্ন উপাদানের উপর প্রায় পাঁচ শতাধিক আয়াত নাযিল করা হয়েছে। নাযিলকৃত আয়াতসমূহে বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া হাদিসেও বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ ও এর উপাদানসমূহের যথাযথ ব্যবহারের জন্য গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইসলাম এবং বাস্তুসংস্থান নিয়ে যেসব আধুনিক গবেষক ও ঐতিহাসিক গবেষণা কার্য সম্পাদন করেছেন তাঁদের মধ্যে ব্রিটিশ-পাকিস্তান এয়ারফোর্সের অফিসার জনাব ফাজলুন খালিদ[২], এনা এম. গ্যাড[৩], রিচার্ড ফল্টেজ[৪] প্রমুখ অন্যতম। তাঁদের গবেষণায় ইসলাম এবং বাস্তুসংস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপিত হলেও বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির উপর তথ্য পর্যাপ্ত নয়। এমনকি বাংলা ভাষায়ও এই সংক্রান্ত পর্যাপ্ত গবেষণা কার্য সম্পাদিত হয়নি। ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতির গুণগত ধারা (Qualitative Method) অনুসরণ করে বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার, আকর ও দ্বৈতীয়িক উৎসের সমন্বয় সাধন করে বাস্তুসংস্থানের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ নির্ণয় এবং এর উপাদানসমূহ সম্পর্কে আল-কুরআনের উদ্ধৃতি ও হাদিস বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমান প্রবন্ধ প্রণয়নের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

বাস্তুসংস্থান

বাস্তুসংস্থানের ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Ecology', যা গ্রিক শব্দ 'Oikos' ও 'Logos' থেকে উদ্ভূত। 'Oikos' অর্থ বাসস্থান আর 'Logos' অর্থ জ্ঞান। অর্থাৎ শব্দগত অর্থে বাসস্থান সম্পর্কিত জ্ঞানই হচ্ছে বাস্তুসংস্থান। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী Ernst Haeckel সর্বপ্রথম 'Oekologie' শব্দটি ব্যবহার করেন। এই 'Oekologie' শব্দটি থেকে 'Ecology' শব্দের উৎপত্তি। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে এ. জি. ট্যান্সলে (A. G. Tansley) বাস্তুতন্ত্র বা 'Eco-system' শব্দটি প্রয়োগ করেন। তিনি পরিবেশ অর্থে 'Eco' শব্দটি ব্যবহার করেন এবং পরবর্তীতে বিজ্ঞানী ওয়েবস্টার (Webstar) 'system' শব্দটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। রবার্ট ই. রিকলিফ (Robert E. Ricklefs) বলেন, "জীব এবং পরিবেশের পারস্পরিক আন্ত:সম্পর্ক নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের অধ্যয়নকে বাস্তুসংস্থান বলে।"[৫] মেরিয়াম ওয়েবস্টার কলেজিয়েট ডিকশনারি (Merriam Webstar's Collegiate Dictionary) অনুযায়ী, "বাস্তুসংস্থান হলো জীবগোষ্ঠীসমূহ ও তাদের পরিবেশের মধ্যে সম্পর্কের সমষ্টি বা ধরনের উপর জোর দিয়ে বসতিস্থানের জীবসমূহের অধ্যয়ন।"[৬] আর্নেস্ট হ্যাকেল (Ernst Haeckel, 1869) বলেন, "জৈব এবং অজৈব উভয় পরিবেশে জীবের সামগ্রিক সম্পর্কই হলো বাস্তুসংস্থান।"[৭] টেইলর (Taylor, 1936) বলেন, "সকল জীবগোষ্ঠীসমূহের সাথে তাদের সামগ্রিক পরিবেশের সামষ্টিক সম্পর্কের বিজ্ঞানই হলো বাস্তুসংস্থান।"[৮] অর্থাৎ বাস্তুসংস্থান হলো একটি পরিবেশের সকল জীবের সাথে ঐ পরিবেশের সকল উপাদানের সম্পর্কের বিজ্ঞান। চার্লস ইটন (Charles Elton, 1947) তাঁর বিখ্যাত 'Animal Ecology' গ্রন্থে বাস্তুসংস্থানকে "বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক ইতিহাস" হিসেবে অভিহিত করেছেন।"[৯] বাস্তুবিদ ইউজিনি পি. অডাম (Eugene P. Odum, 1971) বলেন,

> Living (biotic) organisms and their nonliving (abiotic) environment are inseparably interrelated and interact with each other. Any unit that includes all the organisms (the biotic community) in a given area interacting with the physical environment so that a flow of energy leads to clearly defined biotic structures and cycling of materials between living and nonliving components is an ecological system or ecosystem.[10]

অর্থাৎ যে বিশেষ পদ্ধতিতে কোন নির্দিষ্ট বসতিস্থানে অবস্থিত সকল জীবগোষ্ঠী একে অপরের সঙ্গে এবং অজৈব পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া করে কোন একক বা সুস্থিততন্ত্র গঠন করে, সেই একক বা সুস্থিততন্ত্রের ক্রিয়া পদ্ধতি হলো বাস্তুতন্ত্র। সুতরাং বলা যায় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে জীবজগতের যে আন্তঃসম্পর্ক এবং এই সম্পর্কিত গবেষণা ও পঠন-পাঠনের নিমিত্তে যে শাস্ত্র তাই হচ্ছে বাস্তুসংস্থান বা বাস্তুতন্ত্র। পরিবেশ অনুযায়ী বাস্তুসংস্থান ৩ ধরনের। যথাঃ

১. স্থলজ বাস্তুসংস্থান

স্থলকেন্দ্রিক তথা মাটির উপর জৈব, অজৈব ও ভৌত উপাদানসমূহের মিথস্ক্রিয়ায় যে বাস্তুসংস্থানের সৃষ্টি হয়, তাই স্থলজ বাস্তুসংস্থান। স্থলজ বাস্তুসংস্থানের উপাদান হচ্ছে মাটি, প্রাণি (মানুষ, সাপ, ব্যাঙ, ঘাস ফড়িংসহ অন্যান্য জীব) এবং উদ্ভিদ। স্থলজ বাস্তুসংস্থান তিন রকমের হতে পারে।[11] যথাঃ i. বনভূমির বাস্তুসংস্থান, ii. মরুভূমির বাস্তুসংস্থান ও iii. পর্বত শ্রেণির বাস্তুসংস্থান ।

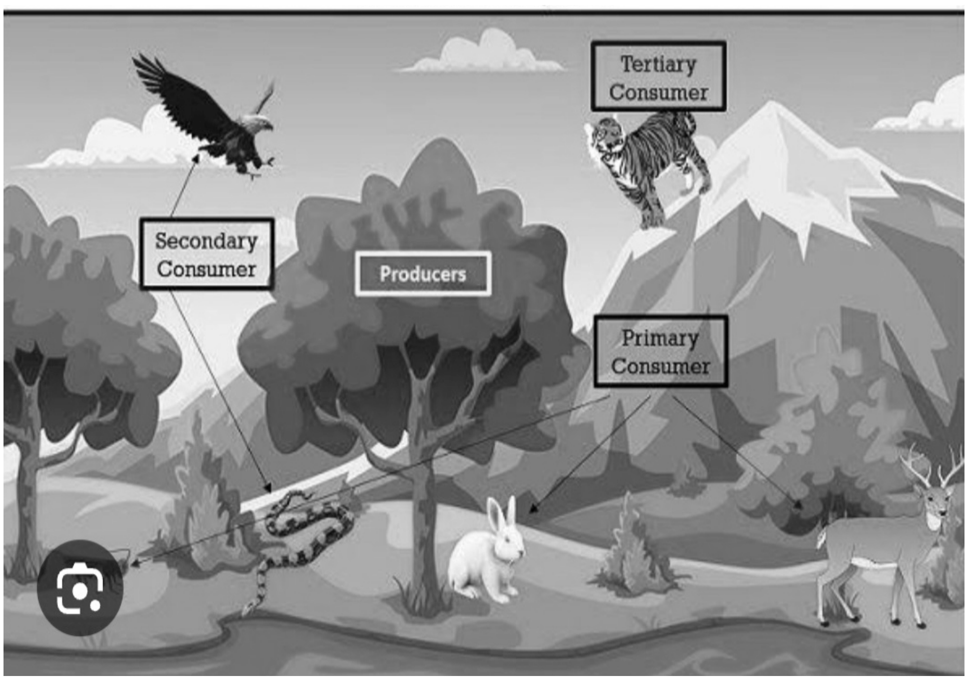

চিত্রঃ স্থলজ বাস্তুসংস্থান[12]

২. জলজ বাস্তুসংস্থান

পানিকেন্দ্রিক জৈব, অজৈব ও ভৌত উপাদানের মিথস্ক্রিয়ায় যে বাস্তুসংস্থানের সৃষ্টি হয়, তাই জলজ বাস্তুসংস্থান। জলজ বাস্তুসংস্থানের উপাদান হচ্ছে প্লাঙ্কটন, মাছ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া। জলজ বাস্তুসংস্থান প্রধানত ২ প্রকার। যথা: i. লবণাক্ত পানি বা সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থান ও ii. মিঠা পানির বাস্তুসংস্থান। মিঠা পানির বাস্তুসংস্থান আবার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যথা: i. স্থির পানির বাস্তুসংস্থান: পুকুর ও হ্রদ, ii. প্রবহমান পানির বাস্তুসংস্থান: নদ-নদী ও iii. জলাভূমির বাস্তুসংস্থান।[১৩] জলজ বাস্তুসংস্থানের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে পুকুরের বাস্তুসংস্থান।

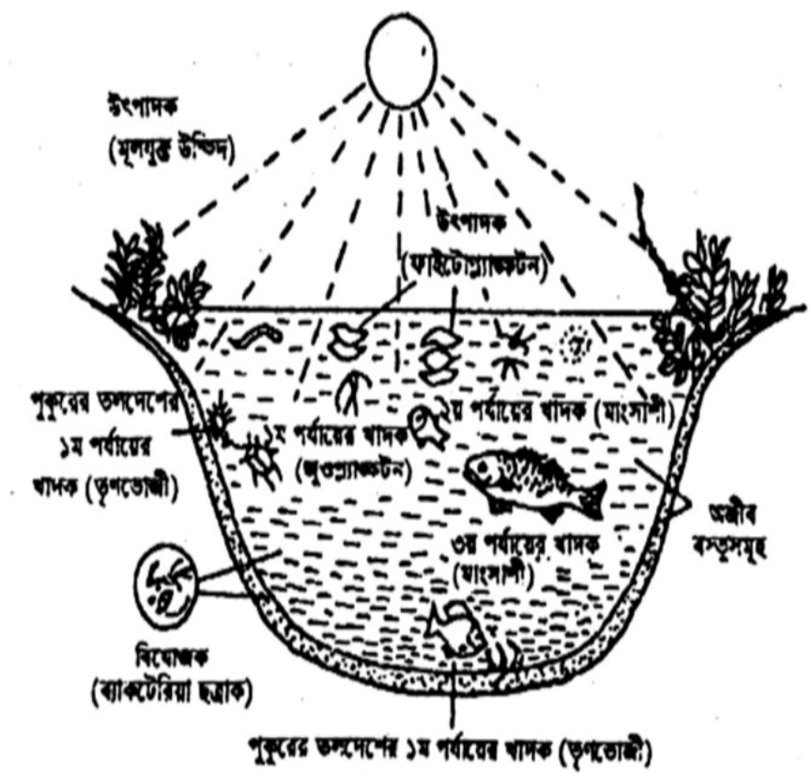

চিত্র: একটি পুকুরের বাস্তুসংস্থান[১৪]

৩. কৃত্রিম বাস্তুসংস্থান

প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক জ্ঞানের সহায়তায় কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ ও প্রাণির উৎপাদন পদ্ধতিকে কৃত্রিম বাস্তুসংস্থান বলা হয়। বিশেষ প্রক্রিয়ায় কাঁচের মধ্যে বায়ুর সাথে অক্সিজেন এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করে কৃত্রিম বাস্তুসংস্থান তৈরি করা হয়। তাই প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থানের সকল উপাদান এখানে অনুপস্থিত থাকে। এ্যাকুরিয়াম এবং চন্দ্রযান এই ধরনের বাস্তুসংস্থানের আদর্শ উদাহরণ।

চিত্রঃ এ্যাকুরিয়াম[১৫]

বাস্তুসংস্থানের উপাদান
বাস্তুসংস্থানের ২ টি উপাদান রয়েছে। যথাঃ ১. জীব উপাদান ও ২. জড় উপাদান।

১. জীব উপাদান

পরিবেশের যে উপাদানগুলো জীবন্ত তাকে জীব উপাদান বলা হয়। আর জীবমন্ডল[১৬] হলো পৃথিবীর ইকোসিস্টেমসমূহের যোগফল। জড় পরিবেশই জীব সম্প্রদায়কে ধারণ করে থাকে। জীবমন্ডলকে প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যথাঃ i. উদ্ভিদকুল ও ii. প্রাণিকুল। আর এর উপাদানসমূহ তিন প্রকার। যথাঃ

ক. উৎপাদকঃ সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় পরিবেশ থেকে পানি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও খনিজ লবণ প্রভৃতি জীব উপাদান গ্রহণ করে নিজেদের জন্য শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। এই সবুজ উদ্ভিদই হচ্ছে স্বভোজী বা উৎপাদক। পৃথিবীর সকল প্রাণি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল। **খ. খাদকঃ** ইকোসিস্টেম প্রক্রিয়ায় উৎপাদক কর্তৃক তৈরি খাদ্যের উপর নির্ভরশীল জীব সম্প্রদায়কে পরভোজী বা খাদক বলা হয়। খাদক আবার তিন প্রকারের হয়ে থাকে। যথাঃ **১ম স্তরের খাদকঃ** যে সকল প্রাণি উদ্ভিদভোজী তথা খাদ্যের জন্য সরাসরি সবুজ উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল, তারা প্রথম স্তরের খাদক। এরা তৃণভোজী নামেও পরিচিত। যেমনঃ গরু, ছাগল, ঘাস ফড়িং, পোকামাকড় ও ছোট মাছ প্রভৃতি। **২য় স্তরের খাদক :** ১ম স্তরের খাদককে যারা ভক্ষণ করে অর্থাৎ যে সকল প্রাণি তৃণভোজী ও অন্যান্য প্রাণিদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে ২য় স্তরের খাদক বলা হয়। এরা মাংসাশী নামেও পরিচিত। যেমনঃ বিভিন্ন পাখি, বিড়াল, ব্যাঙ, শিয়াল, বাঘ, হাঙর ও তিমি প্রভৃতি। **৩য় স্তরের খাদকঃ** যারা দ্বিতীয় স্তরের খাদকদের ভক্ষণ করে অর্থাৎ যে সকল প্রাণি উদ্ভিদ বা অন্যান্য জীবজন্তুকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে তৃতীয় স্তরের খাদক বলা হয়। যেমনঃ মানুষ, বাঘ, সিংহ, শকুন, ময়ূর, সাপ, বাজপাখি প্রভৃতি। এদের মধ্যে কোন কোন প্রাণি আবার একাধিক

স্তরের খাবার খেয়ে থাকে, তাই এদেরকে সর্বোচ্চ শ্রেণির খাদক বা সর্বভুক বলা হয়ে থাকে। ময়ূর যখন উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে খায় তখন সে প্রথম স্তরের খাদক, আবার যখন পোকামাকড় খায় তখন তৃতীয় স্তরের খাদক। আর মানুষ বাস্তুসংস্থানের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করে এবং সর্বোচ্চ স্তরের খাদক প্রাণিও বটে। বাস্তুসংস্থানের মাধ্যমে আল্লাহ সমস্ত জীবের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। **গ. বিয়োজক:** যে সকল অনুজীব মাটি থেকে বর্জ্য এবং মৃত উদ্ভিদ ও জীবদেহের পচন ধরিয়ে প্রোটোপ্লাজমের যৌগগুলোকে অজৈব উপাদানে পরিণত করে এবং তা থেকে কিছুটা খাদ্য গ্রহণ করে এবং বাকিটা অজৈব লবণ হিসেবে প্রাকৃতিক পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়, তাদেরকে বিয়োজক বলা হয়। যেমন: ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে বিয়োজক।[১৭] বিয়োজককে পচনকারীও বলা হয়।

চিত্র: বাস্তুসংস্থানের শক্তিপ্রবাহ ও খাদ্যশৃঙ্খল[১৮]

২. জড় উপাদান

পরিবেশের প্রাণহীন এবং নিশ্চল উপাদানসমূহকে জড় উপাদান বলা হয়। জড় উপাদান ৩ ধরনের। যথা: i. **জৈব উপাদান:** বাস্তুতন্ত্রের প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেড, লিপিড, হিউমিক পদার্থ ও ইউরিয়া হলো মাটির জৈব উপাদান।[১৯] এগুলো জীবজগতের জৈব রাসায়নিক গঠন প্রস্তুত করে। ii. **অজৈব উপাদান:** বাস্তুতন্ত্রে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস ও খনিজ লবণ ইত্যাদি হচ্ছে মাটির অজৈব উপাদান;[২০] যা জীবদেহের গঠন ও জীবন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং পরিবেশে ভূ-রাজনৈতিক চক্রের সাহায্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। iii. **ভৌত উপাদান:** ভৌত বা প্রাকৃতিক বা জলবায়ুগত উপাদানগুলো যথা: সূর্যালোক, তাপমাত্রা, আবহাওয়া, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত ও মাটির গুণাগুণ প্রভৃতি হচ্ছে বাস্তুসংস্থানের ভৌত উপাদান।
নিম্নে ছকের মাধ্যমে বাস্তুসংস্থানের উপর্যুক্ত উপাদানগুলো তুলে ধরা হলো:

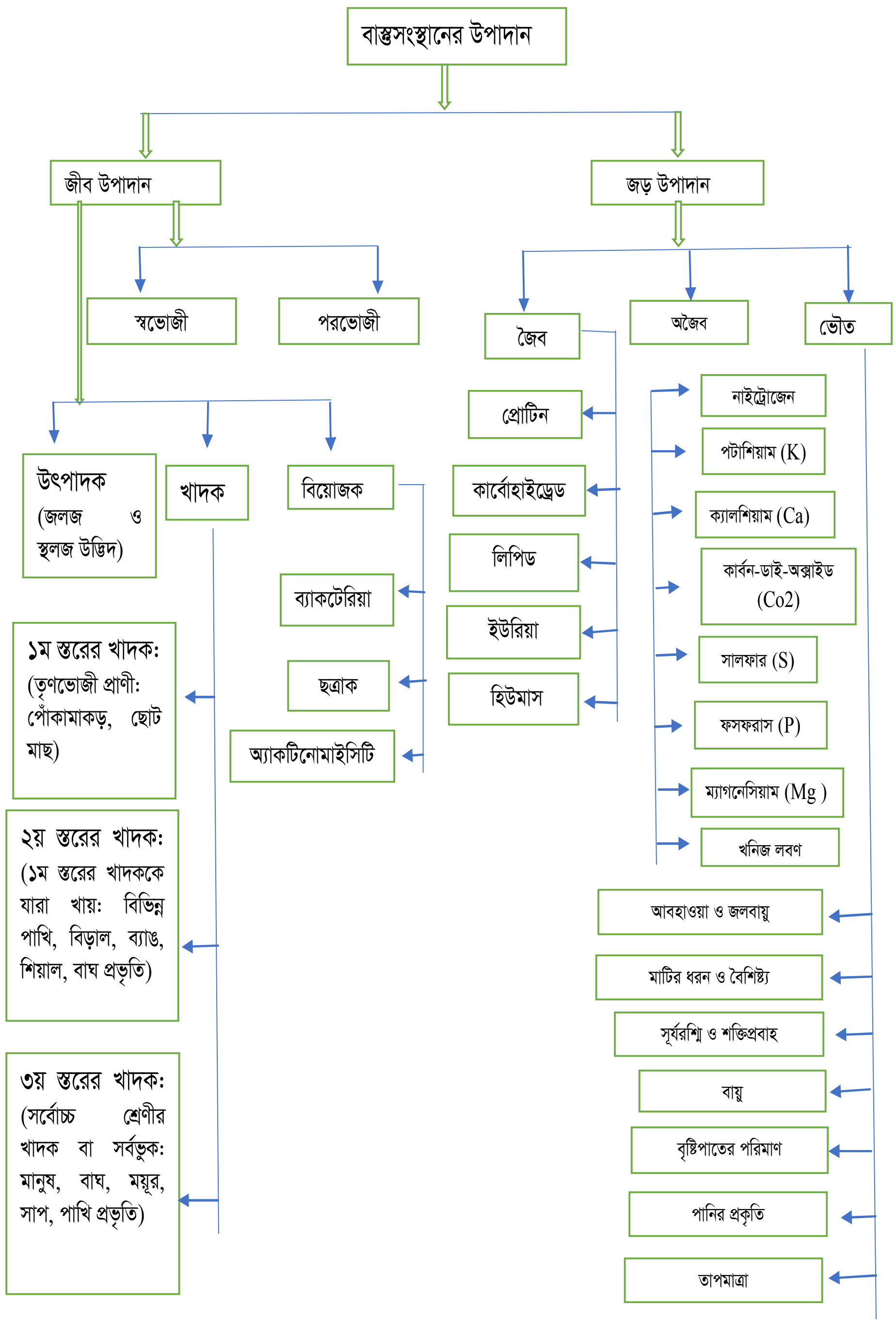
বাস্তুসংস্থানের উপাদান
জীব উপাদান
জড় উপাদান
স্বভোজী
পরভোজী
জৈব
অজৈব
ভৌত
উৎপাদক (জলজ ও স্থলজ উদ্ভিদ)
খাদক
বিয়োজক
ব্যাকটেরিয়া
ছত্রাক
অ্যাকটিনোমাইসিটি
১ম স্তরের খাদক: (তৃণভোজী প্রাণী: পোঁকামাকড়, ছোট মাছ)
২য় স্তরের খাদক: (১ম স্তরের খাদককে যারা খায়: বিভিন্ন পাখি, বিড়াল, ব্যাঙ, শিয়াল, বাঘ প্রভৃতি)
৩য় স্তরের খাদক: (সর্বোচ্চ শ্রেণীর খাদক বা সর্বভুক: মানুষ, বাঘ, ময়ূর, সাপ, পাখি প্রভৃতি)
প্রোটিন
কার্বোহাইড্রেড
লিপিড
ইউরিয়া
হিউমাস
নাইট্রোজেন
পটাশিয়াম (K)
ক্যালশিয়াম (Ca)
কার্বন-ডাই-অক্সাইড (Co2)
সালফার (S)
ফসফরাস (P)
ম্যাগনেসিয়াম (Mg)
খনিজ লবণ
আবহাওয়া ও জলবায়ু
মাটির ধরন ও বৈশিষ্ট্য
সূর্যরশ্মি ও শক্তিপ্রবাহ
বায়ু
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ
পানির প্রকৃতি
তাপমাত্রা

বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ ও ইসলাম

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আনুষ্ঠানিকভাবে বাস্তুতন্ত্রের উদ্ভব ঘটলেও প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে সপ্তম শতাব্দীতেই ইসলামে বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পবিত্র আল-কুরআনের ৬টি সূরা যথা: সূরা বাকারা (গাভী), সূরা আনআম (গৃহপালিত পশু), সূরা আন-নাহল (মৌমাছি), সূরা আন-নমল (পিপীলিকা), সূরা আল-আনকাবুত (মাকড়সা), সূরা ফীল (হাতি)-এর নামকরণ করা হয়েছে বিভিন্ন গবাদিপশু ও জীবজন্তুর নামে। এই নামকরণ থেকেই অনুধাবন করা যায় যে, ইসলামে পরিবেশ তথা বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণের জন্য জীবজন্তু ও পশুপাখি সংরক্ষণের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সূরা আল-রাদ (বজ্রনাদ), সূরা আল হিজর (পাথুরে পাহাড়), সূরা আল-আহকাফ (বালুর পাহাড়), সূরা আয-যারিয়াত (বিক্ষেপকারী বাতাস), সূরা আত্ব-তূর (পাহাড়), সূরা আন-নাজম (তারা), সূরা আল-কামার (চন্দ্র), সূরা আল-হাদীদ (লোহা), সূরা আদ-দাহর (মানুষ), সূরা আল-বুরুজ (নক্ষত্রপুঞ্জ), সূরা আশ-শামস (সূর্য), সূরা আদ-দুহা (পূর্বাহ্নের সূর্যকিরণ), সূরা আত-ত্বীন (ডুমুর), সূরা যিলযাল (ভূমিকম্প), সূরা আন-নাস (মানবজাতি) প্রভৃতি সূরাসমূহে বাস্তুসংস্থানের বিভিন্ন উপাদানের উপর প্রায় পাঁচ শতাধিক আয়াত নাযিল হয়েছে। এর মধ্যে প্রাণি সম্পর্কিত প্রায় দু'শতাধিক আয়াত নাযিল হয়েছে। এসব আয়তসমূহে বাস্তুসংস্থানের বিভিন্ন উপাদান এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এছাড়াও মহানবী (স.) বাস্তুসংস্থানের বিভিন্ন উপাদান ও উপকরণের যথাযথ পরিচর্যা, সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। নিম্নে বাস্তুসংস্থানের বিভিন্ন উপাদান, উপকরণ ও সেগুলোর সংরক্ষণ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোকপাত করা হলো:

মাটি

বাস্তুসংস্থানের একটি অত্যাবশ্যকীয় গুরুত্বপূর্ণ ভৌত উপাদান হচ্ছে মাটি। পরিবেশের জন্যও মাটি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় পবিত্র কুরআনে 'মাটি' শব্দটি ১৭ বার এবং ' ভূমি' শব্দটি ১৩ বার বলা হয়েছে। উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় ভূমি বলতে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগই নয়; বরং মাটি, নদ-নদী, পাহাড়, পর্বতমালা, গাছপালা, পানি, চন্দ্র-সূর্য, বায়ু প্রভৃতি সকল কিছুর সমষ্টিকে বুঝায়। আর মাটি বলতে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগকে বুঝায়, যা কর্ষণ করে চাষাবাদ করা যায় এবং মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ মাটি হচ্ছে ভূমির একটি উপাদান মাত্র। মাটি থেকেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, ''আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার (মাটির) উপাদান থেকে।"[২১] কুরআনে বলা হয়েছে, "তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মত শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে।"[২২] পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ মাটির গঠন, আকার-আকৃতি, উপাদান, বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ এবং উর্বরা শক্তি ও উৎপাদন ক্ষমতা প্রভৃতি অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। একই পৃথিবীর ভূখণ্ড হওয়া সত্ত্বেও অবস্থানের ভিত্তিতে একেক অঞ্চলের মাটির বর্ণ, আকার-আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তারতম্য রয়েছে। কোন ভূখণ্ড উর্বর আবার কোন ভূখণ্ড অনুর্বর হয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ভূমিতে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদিত হয়। এমনকি একই ফসলের গাছ হওয়া সত্ত্বেও একেক ভূমিতে তাদের আকার-আকৃতি, স্বাদ, গন্ধ ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে রয়েছে, "পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড, এর মধ্যে আছে আঙ্গুর বাগান, শস্যের ক্ষেত, একাধিক শিরবিশিষ্ট বা এক শিরবিশিষ্ট খেজুরের গাছ। এদের একই পানি দেওয়া হয়। আর ফল হিসেবে কোন কোন ফলকে অপর ফলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এর মধ্যে নিদর্শন

রয়েছে।"[২৩] মাটি থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় এবং আমরা বিভিন্ন খাদ্যশস্য ও ফলমূল পেয়ে থাকি। কুরআনে বলা হয়েছে- "আর তাদের জন্য মৃত ধরিত্রী একটি নিদর্শন, তাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে শস্য উৎপাদন করি। অত:পর তা থেকেই তারা খায়।"[২৪] মাটি থেকেই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির খাদ্য তৈরি হয়। যেসব শুষ্ক ভূমিতে নদী-নালা প্রবাহিত নয় সেসব ভূমিতে বৃষ্টির পানি প্রবাহিত করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ শস্য উৎপাদনের যোগ্য করে তোলেন। আল্লাহ্ বলেন, "তারা কি লক্ষ্য করে না, আমি ঊষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে শস্য উৎপন্ন করি, যার থেকে তাদের গবাদিপশু এবং তারা আহার করে? তারা কি তবুও লক্ষ্য করবে না?"[২৫] মহান আল্লাহ্ অনুর্বর মাটিকে বৃষ্টির মাধ্যমে উর্বর মাটিতে রূপান্তরিত করেন এবং উৎপন্ন করেন খাদ্যের সমারোহ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তুমি মাটিকে দেখো শুষ্ক, অতঃপর আমি সেখানে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ; এই তো প্রমাণ যে আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[২৬] বৃষ্টির কল্যাণধারা সমভাবে বণ্টিত হলেও সকল ভূমিতে সমভাবে ফসল উৎপাদিত হয় না। উর্বর ভূমিতে ফসল উৎপাদিত হলেও অনুর্বর ভূমিতে আশানুরূপ ফসল উৎপন্ন হয় না। আর তাই সেসব অনুর্বর ভূমিতে ফসল উৎপাদন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এ প্রসঙ্গে কুরআনে রয়েছে, "উৎকৃষ্ট ভূমি থেকে তার প্রভুর অনুমতিক্রমে ফসল উৎপন্ন হয় এবং নিকৃষ্ট ভূমিতে কঠোর পরিশ্রম ছাড়া কিছুই জন্মায় না। এভাবেই কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনগুলো আমি নানা প্রকারে বর্ণনা করি।"[২৭] কুরআনে রয়েছে, "তারা কি জমিনের দিকে লক্ষ্য করে না? আমি সেখানে প্রত্যেক প্রকারের উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদ্গত করেছি। নিশ্চয়ই তার মধ্যে আছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। আর তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।"[২৮] মূলত মাটি ছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণি সকল কিছুর অস্তিত্বই অসম্ভব ব্যাপার। মাটি থেকেই বিভিন্ন খাদ্যশস্য ও উদ্ভিদ উৎপাদিত হয়। আর মহান আল্লাহ্ মাটি থেকেই সকল কিছু উৎপাদন করেছেন। তাই বাস্তুসংস্থানের অন্যতম প্রধান উপাদান মাটির কার্যকর ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণ করার জন্যে ইসলামে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

পানি

বাস্তুতন্ত্রের অন্যতম প্রধান ভৌত উপাদান হচ্ছে পানি। প্রাণি এবং উদ্ভিদ উভয়ের জন্যই পানির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া প্রাণিকুল ও উদ্ভিদকুল বাঁচতে পারে না। পরিবেশের জন্যও পানি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় পবিত্র কুরআনে 'পানি' শব্দটি ৩২ বার এবং ৫৯টি আয়াতে পানি ও পানির উৎস সম্পর্কে বলা হয়েছে। পানির প্রাকৃতিক উৎস হচ্ছে বৃষ্টি, নদ-নদী, সমুদ্র, ঝরণা, হ্রদ এবং ভূগর্ভস্থ পানি। পানি থেকেই পৃথিবী এবং পৃথিবীর সকল জীবকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম।"[২৯] কুরআনে বলা হয়েছে, "আর আল্লাহ্ প্রত্যেক জীবকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের কিছু সংখ্যক পেটে ভর দিয়ে চলে, কিছু সংখ্যক দুই পায়ে চলে, আবার কিছু সংখ্যক চার পায়ে চলে, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[৩০] আল্লাহ্ মানুষের কল্যাণে সমগ্র বিশ্বে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি সরবরাহ করেন। মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য আল্লাহ্ই সুপেয় পানি বৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীতে সরবরাহ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা যে পানি পান করো সে সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছো? তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আনো, না আমি তা বর্ষণ করি। আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো

না?[৩১] খাদ্যশস্য, উদ্ভিদ ও গাছপালা উৎপাদনের জন্য আল্লাহ্ বৃষ্টির মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে পানি প্রেরণ করেন। কুরআনে রয়েছে, "আমি ঘন মেঘমালা থেকে মুষলধারে বৃষ্টিপাত করি, তা দিয়ে উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ ও ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান।"[৩২] আল্লাহ্ ভূপৃষ্ঠের প্রয়োজন অনুযায়ী নদ-নদী, সমুদ্র ও ভূগর্ভে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন; যাতে শস্য উৎপাদনে ব্যাঘাত না ঘটে। কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী, "আর আমি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করি; অতঃপর তা মাটিতে সংরক্ষিত করি; আর আমি তা অপসারণ করতেও সক্ষম। অতঃপর আমি তা দিয়ে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি; তার মধ্যে তোমাদের জন্য থাকে প্রচুর ফল; আর তা থেকে তোমরা খেয়ে থাকো।"[৩৩] কুরআনে রয়েছে, "মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক! আমিই প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি, অতঃপর ভূমিকে প্রকৃষ্টরূপে বিদীর্ণ করি এবং তার মধ্যে উৎপন্ন করি শস্য, আঙ্গুর, শাকসবজি, জয়তুন, খেজুর, গাছ-গাছালির উদ্যান, ফল ও গবাদি খাদ্য। এগুলো তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের ভোগের জন্য।"[৩৪] মানুষ, পশু-পাখি, জীবজন্তু প্রভৃতি সকল প্রাণির জন্য পানি থেকে খাদ্য উৎপন্ন করা হয়। কুরআনে বলা হয়েছে, ''তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন। এতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা থেকে উৎপন্ন হয় উদ্ভিদ, যাতে তোমরা পশুচারণ কর। এর (পানি) দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন শস্য, জয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল। অবশ্যই এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"[৩৫] আল্লাহ্ পানিকে বরকতময় হিসেবে মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে রয়েছে, "আর আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তা দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি।"[৩৬] আল্লাহ্ বলেন, "তুমি কি দেখো না, আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তা দিয়ে বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর যখন তা শুকিয়ে যায় তখন তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তা খড়কুটোয় পরিণত করেন। অবশ্যই এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য উপদেশ রয়েছে।"[৩৭] পানির স্বাভাবিক প্রবাহ নিম্নমূখী। নিম্নমূখী প্রবাহের কারণে পানি যাতে মাটির নিচে চলে না যায় সে ব্যবস্থাও মহান আল্লাহ্ করেছেন। কুরআনে রয়েছে, "তোমরা ভেবে দেখেছো কি, ভূগর্ভের পানি যদি তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন কে তোমাদেরকে এনে দিবে প্রবহমান পানি?"[৩৮] যথাসময়ে পরিমিত বৃষ্টিপাত হলে ফসল ও শস্য উৎপাদন সহজ হয় এবং মৎস্য প্রজনন বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে না পারলে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, খরা ও বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব মানুষের। এই প্রসঙ্গে কুরআনে রয়েছে, "মানুষের কৃতকর্মের কারণে সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে।"[৩৯]

মহানবী (স) পানির ব্যবহারে যত্নশীল হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। দৈনন্দিন জীবনে পানির ব্যবহার অত্যাবশ্যক। মুসলমানরা দিনে পাঁচবার নামাজের উদ্দেশ্যে পানি ব্যবহার করে অযু করে থাকে। ইসলামে অযু করার ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত পানি ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মুহাম্মদ ইবন ইয়াহিয়া (রহ.) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) একবার সাদ (রা.) এর নিকট গেলেন। এই সময় সাদ (রা.) অযু করছিলেন এবং বেশি পানি ব্যবহার করছিলেন। তখন রাসূল (স.) তাকে বলেন, এটা কেমন অপচয়? তখন তিনি জানতে চান, হে রাসূল (স.) অযুর মধ্যে কি অপচয় আছে? তখন রাসূল (স.) জবাব দেন, হ্যাঁ। যদিও তুমি প্রবাহিত পানির উপর অবস্থান কর।[৪০] এমনকি পানির উৎসসমূহে মলত্যাগ করে নষ্ট না করার ব্যাপারেও সতর্কতার দ্বারা প্রকারান্তরে পানি সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স) কে বলতে শুনেছেন "তোমাদের কেউ যেন স্থির- যা প্রবাহিত নয় এমন

পানিতে প্রস্রাব না করে। পরে সে আবার তাতে গোসল করবে।"[৪১] হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে, "রাসূল (স) স্থির পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।"[৪২] মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "তোমরা অভিসম্পাতযোগ্য তিনটি কাজ থেকে দূরে থাক: পানিতে থুথু ফেলা, যাতায়াতের পথে এবং ছায়াদার স্থানে মলত্যাগ করা।"[৪৩] পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং মানুষের অধিকার রক্ষায় মহানবী (স) কর্তৃক অযু করার ক্ষেত্রে পানির ব্যাপারে সতর্কতা থেকেও বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। সুতরাং বলা যায়, পৃথিবীর যা কিছু প্রাণ পেয়েছে তা কেবল পানি থেকেই উৎপন্ন। অর্থাৎ পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টির মূল উৎস পানি এবং পানি ব্যতীত কোন প্রাণির বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই পানির যথাযথ ব্যবহার ও পানি দূষণ রোধ করার মাধ্যমে বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণের ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

বায়ু/বাতাস

প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য বায়ুর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বায়ু সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মহান আল্লাহ্ অতি চমৎকারভাবে বাস্তুসংস্থানের প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। যেমন: তিনি প্রথমে বায়ু প্রবাহিত করেন। তারপর তিনি পানি বর্ষণ করেন। যা মানুষ, প্রাণি, অন্যান্য জীব ও গাছপালার জন্য অত্যাবশ্যক। আবার এই পানি দ্বারাই শস্য ও ফলমূল উৎপন্ন হয়, যা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণি খাবার হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। এমনকি তিনি ইচ্ছা করলে বায়ু প্রবাহ বন্ধ করেও দিতে পারেন। কিন্তু তিনি বায়ু প্রবাহের ধারা অব্যাহত রেখে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন। এই শৃঙ্খলা বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ্ বাস্তুসংস্থানের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করেছেন, যার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ স্বয়ং আল্লাহ্র হাতে। এতে যেন কোন বাঁধার সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে পবিত্র কুরআনে নির্দেশনা রয়েছে। বায়ুর অভাবে অক্সিজেন না থাকলে প্রাণিকুলের বেঁচে থাকা অসম্ভব ব্যাপার। তাই প্রাণির বেঁচে থাকার জন্য বায়ু অত্যাবশ্যক। কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চারিত করেন।"[৪৪] বাস্তুসংস্থানের কার্যক্রম পরিচালনায় বায়ুর ভূমিকাই মূখ্য। বায়ু থেকেই মেঘ হয়, মেঘ থেকে বৃষ্টি, বৃষ্টি থেকে ভূমি উর্বরতা লাভ করে এবং শস্য-শ্যামল হয়ে ওঠে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, ''তিনি আল্লাহ্, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং পরে তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন। এরপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। অতঃপর তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তা পৌঁছান; তখন তারা আনন্দিত হয়।"[৪৫] আল্লাহ্র অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে বায়ু অন্যতম প্রধান নিয়ামত। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। যখন তা ঘন মেঘ বহন করে তখন আমি তা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি, পরে তার থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি। তারপর তা দিয়ে সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করি। এভাবে মৃতকে জীবিত করি যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ করো।"[৪৬] আল্লাহ্ সুসংবাদের পূর্বাভাসস্বরূপ বাতাস প্রেরণ করেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, "তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন এবং (তখন) আমি আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। তা দিয়ে আমি মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে অসংখ্য জীবজন্তু ও মানুষকে তা পান করাই।"[৪৭] আল্লাহ্র নিকট পানির অবারিত ও অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে। যখন তিনি প্রয়োজন মনে করেন, তখন বৃষ্টি আকারে পৃথিবীতে বর্ষণ করেন। আল্লাহ্ বলেন, "আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি; অতঃপর আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করতে দেই, আর তোমরা তার (পানির) ভাণ্ডার রক্ষক নও।"[৪৮] আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রেরিত বায়ুর মাধ্যমে

স্রোতের অনুকূল ও প্রতিকূলে জলযান চলাচল করে থাকে। এর মাধ্যমে মানুষ সহজেই যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর একটি এই যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদ দেওয়ার জন্য ও তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ আস্বাদন করানোর জন্য; এবং যাতে তাঁর নির্দেশে নৌযানগুলো বিচরণ করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধ্যান করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"[৪৯] বায়ু প্রবাহ বন্ধ করে দিলে জোয়ার-ভাটা সংঘটিত হত না। এমনকি যোগাযোগও স্থবির হয়ে যেত। আল-কুরআনে রয়েছে, "তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ সমুদ্রের বুকে নিশ্চল হয়ে পড়বে। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।"[৫০] তাছাড়া হাদিসেও বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণের ব্যাপারে অনুপ্রেরণা প্রদান করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তোমরা বাতাসকে গালি দিও না; কেননা তা (বান্দাদের প্রতি) আল্লাহর রহমত ও আযাব নিয়ে আসে। বরং তোমরা আল্লাহর কাছে তার ভালোটুকুর প্রার্থনা কর এবং তার মন্দটুকু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর।"[৫১] এমনকি বায়ু দ্বারা আল্লাহ অনেক জাতিকে ধ্বংসও করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, "নবী (স.) বলেন, পূবালী বায়ু দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে আর পশ্চিমের বায়ু দ্বারা আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে।"[৫২] আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) যখন আকাশে মেঘ দেখতেন, তখন একবার সামনে অগ্রসর হতেন, আবার পেছনে সরে যেতেন। আবার কখনও ঘরে প্রবেশ করতেন, আবার বের হয়ে যেতেন আর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যেত। পরে যখন আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করত তখন তার এ অবস্থা কেটে যেত। আয়িশা (রা.) এর কারণ জানতে চাইলে নবী (স.) বলেন, আমি জানি না, এ মেঘ ঐ মেঘ কিনা যা দেখে আদ জাতি বলেছিল ঃ এ মেঘ আমাদের বর্ষণ করবে, অথচ তা সেই আযাব, যার ব্যাপারে তোমরা তাড়া দিয়েছিলে।"[৫৩]

পরিবেশের দূষণ রোধে মৃত প্রাণি ও জীবজন্তুর দেহ মাটিতে পুতে ফেলার ব্যাপারেও পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "অতঃপর আল্লাহ্ একটি কাক পাঠালেন, যে তার ভাইয়ের মৃতদেহ কিভাবে গোপন করা যায় তা দেখাবার জন্য মাটি খনন করতে লাগল। সে বলল হায়! আমি কি এই কাকের মতও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাইয়ের মৃতদেহ গোপন করতে পারি? অতঃপর সে লজ্জিত হল।"[৫৪] বায়ু দূষণমুক্ত রাখার জন্য মহানবী (স.) নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিসে রয়েছে, মৃত শরীরের কোন অংশ তিনি যত্রতত্র ফেলতেন না কারণ তা একসময় শুকিয়ে মাটিতে মিশে যেতে পারে। যা পুঁতে না ফেললে তা কোন প্রাণি বা পাখির দ্বারা ছড়িয়ে পরিবেশ দূষিত করতে পারে। এজন্য রাসূল (স.) রক্ত বা মাংস মাটিতে পুঁতে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। বায়ু দূষণের মাধ্যমে একজনের রোগ-জীবাণু অন্যজনের নিকট স্থানান্তরিত হয় এবং নানা রোগ-বালাই সৃষ্টি হয়। তাই বায়ু দূষণমুক্ত রাখার জন্য ইসলামে সার্বিক নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ্র সৃষ্ট বায়ুমণ্ডল যাতে পরিবেশের স্বাভাবিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন এবং এগুলো সংরক্ষণ করা আমাদের কর্তব্য।

উদ্ভিদ ও গাছ-গাছালি

বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য রক্ষায় উদ্ভিদ ও গাছ-গাছালির ভূমিকা অপরিসীম। উদ্ভিদ ও পরিবেশ একে অপরের পরিপূরক। বাস্তুসংস্থানের অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো মানুষ ও উদ্ভিদ। সবুজ গাছপালার উপর নির্ভর করে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিরা বেঁচে থাকে। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাটি থেকে খাদ্য তৈরি করে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ ও অক্সিজেন ত্যাগ করে। অন্যদিকে মানুষ নিশ্বাস নেয়ার সময় প্রকৃতিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে এবং উদ্ভিদের থেকে

অক্সিজেন গ্রহণ করে। এভাবে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের ভারসাম্য রক্ষা হয়। এমনকি পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ হচ্ছে নাইট্রোজেন। এই নাইট্রোজেন শোষণ করেও উদ্ভিদ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রাণবন্ত রাখতে উদ্ভিদের ভূমিকা অপরিসীম। আর এই উদ্ভিদ মহান আল্লাহ্ তায়ালার অনবদ্য সৃষ্টি। আল্লাহ্র অপূর্ব সৃষ্টির অনন্য কৌশল হলো উদ্ভিদের জন্য পানির প্রয়োজন, আর উদ্ভিদ মাটিতে পানি সংরক্ষণে সহায়তা করে। আর বনাঞ্চল থাকলে অধিক বৃষ্টিপাত হয়। আর এই প্রক্রিয়াটি হচ্ছে পানি ও উদ্ভিদের জীবনচক্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। আল্লাহ্ বলেন, "আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং তাতে উদ্গত করেছি নয়নপ্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদরাজি। এটি আল্লাহ্র অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ।"[৫৫] মহাবিশ্বের প্রতিটি উপাদান মহান আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণাধীন। কুরআনে রয়েছে, "তৃণলতা ও বৃক্ষাদি তাঁরই সিজদারত (নিয়ম মেনে চলে)।"[৫৬] আল্লাহ উদ্ভিদ ও গাছপালা সৃষ্টি ও বংশবিস্তার অব্যাহত রাখার জন্য নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে বীজ বপন করতে হয়। বীজ থেকে চারা গাছ অঙ্কুরিত হয় এবং তা ধীরে ধীরে মহীরূহরূপে বিস্তার লাভ করে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে রয়েছে, "আল্লাহ্ই শস্য-বীজ ও আঁটি অঙ্কুরিত করেন।"[৫৭] উৎপাদিত উদ্ভিদ, গাছপালা ও শস্যসমূহ আল্লাহ্র অপার মহিমাতে প্রাকৃতিক উপায়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। আল-কুরআনে রয়েছে, "তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছো কি? তোমরাই কি একে অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি? আমি ইচ্ছা করলে তা খড়কুটোয় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা অবাক হয়ে বলতে, আমরাতো দায়গ্রস্ত হয়ে পড়েছি! বরং আমরা হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েছি!"[৫৮] মহান সৃষ্টিকর্তা জীবজগতের প্রয়োজন অনুযায়ী নানা রকমের ফল ও খাদ্য-শস্য সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন, "আর তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তার দ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্গত করি, অনন্তর তার থেকে সবুজ পাতা উদ্গত করি, পরে তার থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি বের করি এবং সৃষ্টি করি আঙ্গুরের উদ্যান, জয়তুন ও ডালিম। এরা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। লক্ষ্য করো তাদের ফলের প্রতি, যখন তারা ফলবান হয় ও ফল পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়; নিশ্চয়ই এগুলোতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"[৫৯] কুরআনে রয়েছে, "তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য। সেখানে রয়েছে ফলমূল, খেজুর বৃক্ষ যার ফল আবরণযুক্ত এবং খোসাবিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ ফুল। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?"[৬০] এমনকি পর্বতের কঠিন ও শুষ্ক ভূমিতেও তিনি গাছ সৃষ্টি করেন। এই প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে রয়েছে, "আর আমি সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা সিনাই পর্বতে জন্মায়, এর থেকে উৎপন্ন হয় তৈল ও আহারকারীদের জন্য ব্যঞ্জন।"[৬১] আল্লাহ্ তার সৃষ্ট বাগান থেকে বিভিন্ন ফল ও শস্য প্রয়োজন অনুযায়ী নিজে খাওয়ার এবং অন্যদেরকে প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে অপচয় না করার জন্য সতর্ক করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আর তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন; খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ-বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, জয়তুন ও ডালিমও সৃষ্টি করেছেন- এগুলো একে অন্যের সদৃশ ও বৈসদৃশও। যখন তারা ফলবান হয় তখন তোমরা তার ফল খাবে আর ফসল তোলার দিনে তার হক প্রদান করবে (বান্দার হক) এবং তোমরা অপচয় করবে না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।"[৬২] আল্লাহ্ সৃষ্টিজগতের উপকারিতার জন্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে উদ্ভিদ থেকে আগুন জ্বালানো। আল্লাহ্ বলেন, "তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা দিয়ে প্রজ্বলিত কর।"[৬৩] এ প্রসঙ্গে কুরআনে আরো রয়েছে, "তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর, তা লক্ষ্য করে

দেখেছো কি? তোমরাই কি বৃক্ষ সৃষ্টি কর (যার থেকে আগুন হয়), না আমি তা সৃষ্টি করি? আমি একে করেছি নিদর্শন ও মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু।"[৬৪]

বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য রক্ষায় মহানবী (স.) বৃক্ষরোপনের জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, "কোন মুসলমান যদি একটি বৃক্ষ বা গাছ রোপন করে অথবা ক্ষেত-খামার করে, অত:পর তা থেকে মানুষ, পাখি বা কোন প্রাণি ভক্ষণ করে, তা তার জন্য দান বা সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব হবে।"[৬৫] উন্মুক্ত মাঠে বা রাস্তার পাশে গাছপালা মানুষ ও পশু-পাখিকে ছায়া ও অক্সিজেন দান করে থাকে। প্রয়োজন ব্যতীত গাছ কাটা যাবে না। হযরত হাসসান ইবনে ইব্রাহীম বর্ণনা করেন, "আমি মক্কার এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, যে লোক কুল গাছ কাটে তাকে রাসূল (স.) অভিসম্পাত করেছেন।"[৬৬] আব্দুল্লাহ ইবনে হুবশী থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে গাছ কাটবে, আল্লাহ্ তার মাথা উপুর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।"[৬৭] সুতরাং বলা যায় যে, মহান আল্লাহ্ বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে উদ্ভিদ ও গাছপালা সৃষ্টি করেছেন। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার উপাদানসমূহ উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়। এছাড়াও এগুলো মানুষ ও জীবের জন্য অক্সিজেন সরবরাহ করে, ঝড়-তুফান প্রতিরোধ করে, মাটির ক্ষয়রোধ করে এবং পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখে। তাই এগুলোর যথাযথ পরিচর্যা, সুরক্ষা ও সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরী। কেননা নির্বিচারে গাছপালা কেটে বন উজাড় করলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাবে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও হাদিসে উদ্ভিদ ও গাছপালা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

মানুষ, জীবজন্তু ও পশু-পাখি

একটি পরিবেশের মূল উপাদান হলো মানুষ, জীবজন্তু ও পশু-পাখি। এগুলো আল্লাহ্ তায়ালার অনন্য দান ও নিয়ামত। আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষের উপকার ও সুবিধার জন্য যাবতীয় জিনিস সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সাগরে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিজিক দান করেছি এবং আমরা যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"[৬৮] কুরআনে রয়েছে, "তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত-তোমরা তা দেখছো। তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যাতে এটি তোমাদের নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জীবজন্তু এবং আমিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে এতে উদ্গত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ।"[৬৯] আল্লাহ্ বলেন, "তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের শূন্যগর্ভে নিয়ন্ত্রাধীন বিহঙ্গের প্রতি? আল্লাহ ব্যতীত কেউ তাদেরকে স্থির রাখে না। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।"[৭০] মানুষের আমিষের যোগান দেয় জীবজন্তু ও পশুপাখি। কুরআনে রয়েছে, "এমন কত জীবজন্তু আছে যারা নিজেদের খাদ্য মজুদ রাখে না। আল্লাহ্ই রিজিক দান করেন তাদের ও তোমাদেরকে।"[৭১] পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রতিটি জীব এবং পাখি একেকটি স্বতন্ত্র জাতি এবং বাস্তুসংস্থানের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন, "ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল জীব এবং নিজ ডানার সাহায্যে উড়ন্ত পাখি-তারা সকলে তোমাদের মতই এক একটি জাতি। কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেই নাই; অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাদেরকে একত্রিত করা হবে।"[৭২] মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য মহান আল্লাহ্ এসব গবাদিপশু ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন।

কুরআনে রয়েছে, "আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য আনআম (গবাদিপশু) সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের কতকের উপর আরোহণ কর এবং কতক তোমরা আহার কর। এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকার। তোমরা অন্তরে যা প্রয়োজন বোধ কর এর দ্বারা তা পূর্ণ করতে পার। আর এদের উপর ও নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়।"[৭৩] মানুষের উপকারের জন্য এসব জীবজন্তু ও পশু-পাখিকে আল্লাহ্ মানুষের বশীভূত করে দিয়েছেন। অনেক গবাদি পশু-পাখির মাংস ও পানীয় মানুষের খাওয়ার জন্য হালাল করা হয়েছে। অনেক গবাদি পশুকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পশুর চামড়া ও চুল দ্বারা বস্ত্র ও আসবাবপত্র তৈরি করা, পশুর দাঁত দ্বারা বিভিন্ন তৈজসপত্র তৈরিসহ নানাবিধ প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। আল্লাহ্ বলেন, "তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমার হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি 'আনআম' (গৃহপালিত পশু) এবং তারাই এগুলোর অধিকারী? এবং আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। এগুলোর কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে। তাদের জন্য এগুলোতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না?"[৭৪] কুরআনের ভাষায়, "আর যিনি সকল প্রকারের জোড়া যুগল সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও 'আনআম' (গৃহপালিত পশু), যাতে তোমরা আরোহণ কর, যাতে তোমরা তাদের পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার। তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা তার উপর স্থির হয়ে বস; এবং বল, 'পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন', যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে।"[৭৫] কুরআনে আরো রয়েছে, "আল্লাহ্ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুর চামড়া দিয়ে তাবুর ব্যবস্থা করেন, তোমরা একে সহজ মনে কর ভ্রমণকালে এবং অবস্থানকালে এবং তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন তাদের পশম, লোম ও চুল থেকে কিছু কালের গৃহ-সামগ্রী ও ব্যবহার-উপকরণ।"[৭৬] মহাগ্রন্থ আল কুরআনে গবাদি পশুর নানাবিধ উপকারিতা সম্পর্কে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, "তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য এতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং তার থেকে তোমরা আহার করে থাক এবং তোমরা যখন গোধূলি লগ্নে এদেরকে চারণভূমি থেকে ঘরে নিয়ে আস এবং প্রভাতে যখন এদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তোমরা এর সৌন্দর্য উপভোগ কর এবং এরা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় এমন দেশে যেখানে প্রাণান্ত কষ্ট ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক দয়াপরবশ, পরম দয়ালু। তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা অবগত নও।"[৭৭] আল-কুরআনে গবাদি পশু তথা উট, গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুরা যেসব খাবার গ্রহণ করে তা তাদের পেটে গিয়ে প্রক্রিয়াজাত হয়ে অত্যন্ত সুস্বাদু পানীয় আকারে বের হয়। এর মধ্যে মানুষের জন্য শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "অবশ্যই গবাদিপশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেটের গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ; যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।"[৭৮] আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষার বিষয় আছে 'আনআম'-এ (গৃহপালিত পশুর মধ্যে)। তোমাদেরকে আমি পান করাই এদের পেটে যা আছে তা থেকে এবং এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা; তোমরা তা থেকে আহার কর এবং তোমরা এতে ও নৌযানে আরোহণ করে থাক।"[৭৯] পশু-পাখির মাংস মানুষের খাওয়ার জন্য হালাল করা হয়েছে। কিন্তু তাদেরকে জবাই করার সময় যাতে কষ্ট না দেয়া হয় সে ব্যাপারে ইসলামে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। জবাই করতে হবে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার মাধ্যমে এবং জবাইকৃত পশুর মাংস নিজের এবং অন্যান্য মানুষের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, "উটকে করেছি

আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম; তোমাদের জন্য এতে কল্যাণ রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় (বেঁধে জবাই করার সময়) তাদের উপর তোমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর। যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তার থেকে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাচঞাকারী অভাবগ্রস্তকে (যে চায় তাকে); এভাবে আমি তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।”[৮০] মৌমাছির চাক হতে তৈরি মধু অত্যন্ত শক্তিদায়ক, সুস্বাদু এবং রোগব্যাধির জন্য কার্যকর ব্যবস্থাপত্র। খাদ্য ও ঋতুর বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে সাদা, হলুদ, লাল প্রভৃতি নানা রঙের মধু উৎপন্ন হয়। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, “তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে তার অন্তরে ইঙ্গিত দিয়ে নির্দেশ করেছেন, ‘গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে সেখানে; এরপর প্রত্যেক ফল থেকে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর।’ এর পেট থেকে বের হয় নানা বর্ণের পানীয়; এতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য। অবশ্যই এতে রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন।”[৮১] মৌমাছির মাধ্যমে তৈরিকৃত মধুর কার্যকারিতা ও গুণাগুণ সম্পর্কে হাদিসেও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।[৮২]

মহানবী (স.) পশু-পাখিকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, একজন স্ত্রীলোক একটি বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কেননা সে এটিকে শক্ত করে বেঁধে রাখে এবং বন্দীদশায় সে এটিকে খাবার দেয়নি, পানীয় দেয়নি এবং সে এটিকে বন্ধনমুক্ত করে ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে জমিনের পোকামাকড় খেয়ে বাঁচতে পারে। অবশেষে বিড়ালটি ক্ষুৎপিপাসায় (কাতর হয়ে) মারা যায়।”[৮৩] আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “একজন লোক রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা লাগলো। সে কূপে নেমে পানি পান করলো। এরপর সে বের হয়ে দেখতে পেল যে, একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে মাটি চাটছে।... সে কূপের মধ্যে নামলো এবং নিজের মোজা ভরে পানি এনে কুকুরটিকে পান করালো। আল্লাহ্ পাক তার আমল কবুল করলেন এবং তার সকল গোনাহ মাফ করে দেন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স.) চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলে কি আমাদের সওয়াব হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক প্রাণির উপকার করাতেই সওয়াব রয়েছে।”[৮৪] মহানবী (স.) পশু-পাখি জবাইয়ের ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। জবাইয়ের বস্তু ধার দেয়া এবং তাদের প্রাণ বেরিয়ে যেতে সহজ পন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, “আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর ‘ইহসান’ অত্যাবশ্যক করেছেন। সুতরাং তোমরা যখন কাতল করবে দয়ার্দ্রতার সাথে কাতল করবে; আর যখন জবাই করবে তখন দয়ার সাথে জবেহ করবে। তোমাদের সকলেই যেন তার ছুরি ধার করে নেয় এবং তার জবেহকৃত জন্তুকে কষ্ট না দেয়।”[৮৫] এছাড়া জীবে দয়া প্রদর্শনের গুরুত্ব সম্পর্কে অপর একটি হাদিসে এসেছে, “তোমরা অহেতুক চড়ুই পাখিকে হত্যা করো না। কেননা কিয়ামতের দিন এটি আল্লাহ্‌র দরবারে নালিশ জানাবে যে তাকে অহেতুক হত্যা করা হয়েছে। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তার অধিকার কি? তিনি বলেন, তার অধিকার হলো তাকে যথানিয়মে জবেহ করে ভক্ষণ করা এবং তার মাথা কেটে নিক্ষেপ না করা।”[৮৬] মহানবী (স.) জীবের প্রতি অসদাচরণ করতে নিষেধ করেছেন এবং উত্তমরূপে সেবাযত্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি একদা একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন অনাহারে উটের পেট ও পিঠ একত্র হয়ে আছে। তখন তিনি বলেন, “তোমরা এ সকল বোবা পশু-পাখির ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তাদেরকে দানাপানি দিয়ে সুস্থ-সবল রাখো ও সুস্থ সবল পশুর পিঠে আরোহণ করো এবং সুস্থ

সবল প্রাণির গোশত খাও।"[৮৭] সকল অবস্থায় পশু-পাখিকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। তাদের ভক্ষণ করলেও উত্তম উপায়ে করতে হবে। গবাদি পশুকে প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ম কুরআন এবং হাদিসে রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় গবাদি পশুকে উঁচু স্থানে রাখতে হবে। খরা মৌসুমে বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করতে হবে। মহানবী (স.) বাল্যকালে মেষ চড়াতেন ও এগুলোর যত্ন নিতেন। ফলে তিনি গবাদিপশুর যত্ন ও সুরক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। সুতরাং বলা যায়, গবাদি পশু ও জীবজন্তুর প্রতিপালন, বিশেষ সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণকেও ইসলামে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইসলামে মানুষসহ সকল জীবের প্রতি সদয় দৃষ্টি দেয়ার কথা বলা হয়েছে। তাদের উপর জুলুম করা, অযথা কষ্ট দেয়া এবং নিরীহ প্রাণি হত্যা করাকে ইসলামে কঠোরভাবে নিষেধ করার মাধ্যমে বাস্তুসংস্থানের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

পাহাড়-পর্বত

সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রভূত কল্যাণের লক্ষ্যে আল্লাহ্ পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনে রয়েছে, "তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন প্রভূত কল্যাণ।"[৮৮] কুরআনের ভাষায়, "তারপর তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন। তিনি তার থেকে বের করেছেন পানি ও তৃণ এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন, এই সমস্ত তোমাদের ও তোমাদের আন'আমের (গবাদি পশুর) ভোগের জন্য।"[৮৯] মহান আল্লাহ্ পৃথিবীকে পাহাড়-পর্বত দ্বারা পেরেকের ন্যায় গেথে রেখেছেন, যাতে ঢলে না পড়ে। কুরআনে রয়েছে, "তিনিই পৃথিবীতে পাহাড় বসিয়েছেন, যাতে এটি তোমাদের নিয়ে ঢলে না পড়ে।"[৯০] এ প্রসঙ্গে কুরআনে আরো রয়েছে, "আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত, যাতে পৃথিবী তাদের নিয়ে এদিক-ওদিক ঢলে না যায় এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ, যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারে।"[৯১] ভূমিকম্প ও ভূমিধ্বসের সময় পৃথিবী যাতে স্থির থাকে এবং ধ্বংস সাধিত না হয় সেজন্য খুব শক্ত ও মজবুত করে সৃষ্টি করেছেন পাহাড়-পর্বত। আল্লাহ্ বলেন, "তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পার।"[৯২] বস্তুত পাহাড়-পর্বত প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে বাস্তুসংস্থানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। তাই ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে অপরিকল্পিত উপায়ে কেটে ধ্বংস সাধন না করে পাহাড়-পর্বতের স্বাভাবিক কাঠামো বজায় রাখা।

নদ-নদী ও সমুদ্র

নদ-নদী ও সাগর-মহাসাগর বাস্তুসংস্থানের অন্তর্নিহিত প্রাণপ্রবাহ অব্যাহত রাখে। মহান আল্লাহ্ মানুষের কল্যাণে মহাসাগরে অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়োজিত রেখেছেন। সাগরের মাছ, জলজ প্রাণি, মনিমুক্তা, প্রবাল, খনিজ লবণ ও গ্যাসসহ নানাবিধ খনিজ সম্পদ সমুদ্রের অভ্যন্তরে মানুষের কল্যাণে নিহিত রেখেছেন। কুরআনে রয়েছে, "তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তার মধ্যে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এর মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে।"[৯৩] সামুদ্রিক মাছ পুষ্টির জন্য অপরিহার্য। সামুদ্রিক মাছ মস্তিষ্ক, চোখ ও স্নায়ুতন্ত্রের গঠন, মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্র কার্যকর রাখা এবং স্ট্রোক ও হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকাংশেই হ্রাস করে থাকে। হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের গবেষক ড. দারিউস মোজাফফারিয়ান বলেন, 'কেউ যদি নিয়মিত মাঝারি মাছ খায় তাহলে তার

হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়।'[৯৪] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মাছ খেতে পার এবং যাতে তা থেকে আহরণ করতে পার রত্নাবলী, যা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান কর এবং তোমরা দেখতে পাও, তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং এটা এজন্য যে তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধ্যান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"[৯৫] মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে নদ-নদী এবং সমুদ্রের পানিসমূহকে মিষ্টি, লবণাক্ত, স্বাদহীন প্রভৃতি নানাপ্রকারে সৃষ্টি করেছেন। কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "তিনিই দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, যার একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয় আর অপরটির পানি লোনা-খর; উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।"[৯৬] এমনকি সমুদ্রের মণিমুক্তা এবং প্রবালসমূহকেও আল্লাহ্ মানুষের জন্য নিয়ামত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যারা পরস্পর মিলিত হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয় দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বতপ্রমাণ নৌযানসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন; সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? "[৯৭] মহানবী (স.) সমুদ্রের পানি ব্যবহারের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স.) কে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা সমুদ্র ভ্রমণে যাই এবং আমাদের সাথে অল্প পরিমাণ পানি নিয়ে থাকি। এ পানি দিয়ে অযু করলে আমরা পিপাসায় কষ্ট পাবো... তখন নবী (স.) বলেন, সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণিও হালাল।"[৯৮] সুতরাং মহান আল্লাহ্র অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে অন্যতম জলজ বাস্তুসংস্থান যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণের প্রতি ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক।

মুসলিম বিশ্বে বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

পবিত্র কুরআন এবং হাদিসের বিধানানুযায়ী মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহে বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণে নানামুখী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী জৈব পরিবেশ সংরক্ষণের একটি সম্মিলিত প্রয়াস ১৯৭১ সালে ইরানের রামসারে অনুষ্ঠিত 'কনভেনশন অন ওয়েটল্যান্ডস' নামক সম্মেলন।[৯৯] এটি 'রামসার কনভেনশন' নামেও পরিচিত। জলজ বাস্তুতন্ত্র রক্ষার জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে রামসার কনভেনশন। ১৯৯২ সালে ব্রিটিশ-পাকিস্তান এয়ারফোর্সের অফিসার জনাব ফাজলুন খালিদ 'ইসলাম এণ্ড ইকোলজি' শীর্ষক একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন।[১০০] পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে তিনি "দ্যা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ফর ইকোলজি এণ্ড দ্যা এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস" (IFEES) নামক যুক্তরাজ্যভিত্তিক পরিবেশ বিষয়ক একটি দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন; যা সমস্ত জীবের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর আবাসস্থল হিসেবে পৃথিবী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিবেদিত।[১০১] পরিবেশের উপর ইসলামি শিক্ষার সম্প্রসারণ, মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, শিক্ষার উপকরণ তৈরি এবং তা প্রচার করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মরক্কো গ্রীণ পরিবেশ কার্যক্রমে সবার থেকে এগিয়ে এসেছে। এই দেশটি প্রথম পরিবেশবান্ধব মসজিদ নির্মাণ করে এবং ২০১৬ সাল থেকে আরো ৬০০টি মসজিদকে পরিবেশবান্ধবরূপে রূপান্তরিত করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।[১০২] তুরস্ক সবুজ উন্নয়ন তথা বনায়ন কর্মসূচি এবং নবায়নযোগ্য এনার্জি তৈরির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। পাকিস্তান বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২০১৪ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে খাইবার প্রদেশে প্রায় ১ বিলিয়ন গাছ লাগানোর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে। পরবর্তী সময়ে ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে আরও ১০

বিলিয়ন গাছ লাগানোর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।[১০৩] স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়; যার প্রতিফলন ঘটে বাংলাদেশের প্রথম প্রণীত সংবিধানে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যত নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করবেন।" বাস্তুসংস্থান ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সাংবিধানিক দায়িত্ব প্রতিপালনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বাধীনতার মাত্র দুই বছরের মধ্যেই ১৯৭৩ সালে 'পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ আদেশ-১৯৭৩' এবং বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য 'বাংলাদেশ ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজারভেশন অর্ডার-১৯৭৩' জারি করা হয়। ১৯৮৯ সালে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ১৯৯২ সালের ২২ মে (আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস) কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে বায়োডাইভার্সিটি (সিবিডি) চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এছাড়াও জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্য সনদের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ 'জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২১' প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন করে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৭ সালে 'বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন' প্রনয়ণ করা হয়। বর্তমানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশে বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২২ সালের ৬ নভেম্বর -২০ নভেম্বর জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন কফ-২৭ (COP-27) মুসলিম বিশ্বের দেশ মিশরে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন কফ-২৮ (COP-28) এর আয়োজক দেশও ছিল মুসলিম বিশ্বের দেশ সংযুক্ত আরব-আমিরাতের দুবাই। জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণকে গুরুত্ব প্রদান করে জাতিসংঘ ২০২০ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য হিসেবে 'জীববৈচিত্র্য উদযাপন' (Celebrate Biodiversity) এবং স্লোগান 'প্রকৃতির জন্য সময়' (Time for Nature) এবং ২০২১ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য হিসেবে 'বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধার' (Ecosystem Restoration) এবং স্লোগান 'প্রকৃতি সংরক্ষণ করি, প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করি' নির্ধারণ করে। এছাড়াও বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে জাতিসংঘ ২০১১-২০২০ দশককে 'ইউএন ডিকেট অন বায়োডাইভার্সিটি' এবং ২০২১-২০৩০ দশককে 'ইউএন ডিকেট অন ইকোসিস্টেম' হিসেবে ঘোষণা করে।[১০৪] অথচ ইসলামে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বেই বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, ইসলামি নির্দেশনা ও মুসলিম বিশ্ব উভয়ই বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণে ইসলামে অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাস্তুসংস্থানকল্পে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও এর উপাদানসমূহের মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন। তিনি উদ্ভিদকুল ও প্রাণিকুলের প্রয়োজনে বায়ু ও পানি সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সৃষ্টি করেছেন উদ্ভিদরাজি ও পাহাড়-পর্বত। আবার এগুলোকে সাগর-মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত করে রেখেছেন, যাতে প্রকৃতিতে প্রাণের সঞ্চার হয়। বাস্তুসংস্থানে অধিক গুরুত্ব দিয়ে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও হাদিসে জীবজগৎ, প্রাণি জগৎ, উদ্ভিদরাজি, পাহাড়-পর্বত, মাটি, বায়ু, নদ-নদী ও পানি প্রভৃতির ব্যবহার, পরিচর্যা, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের কথা বার বার উঠে এসেছে। এসব পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনায় প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের সঠিক ব্যবহার ও পরিচর্যা এবং জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমেই বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ করা সম্ভব। ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তা প্রতিপালন না করায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দিন দিন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে বিশ্বের নিম্নভূমিসমূহ সাগরতলে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতিনিয়ত ঋতুর পরিবর্তন ঘটছে। অপরিকল্পিতভাবে পাহাড় কেটে, নির্বিচারে গাছ কেটে, পুকুর, খাল ও নদী ভরাট করে বসত বাড়ি নির্মাণের মাধ্যমে বাস্তুসংস্থানের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত করার ফলে পৃথিবী ক্রমাগত বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, পানির স্তর বৃদ্ধি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণের জন্য বনাঞ্চল সংরক্ষণ করা, পরিকল্পনাহীনভাবে পাহাড়-পর্বত না কাটা, জীবজন্তু ও পশু-পাখি নির্বিচারে শিকার না করা, পানির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও গ্যাস আহরণের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি মেনে চলা, শিল্প-কারখানার বর্জ্য নিষ্কাশনে নিয়ম মেনে চলা, ইট ভাটার দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা, কার্বন নিঃসরণ বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, যানবাহনের বিষাক্ত কালো ধোঁয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশকে দূষণ মুক্ত রাখা এবং মারণাস্ত্রের অশুভ প্রতিযোগিতা থেকে বিশ্ববাসীকে সচেতন করা অত্যাবশ্যক। তবে একদিনেই এই পরিবর্তন সম্ভব নয়। আমরা যদি ইসলামের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী নিজ নিজ জায়গা থেকে বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করি এবং নিজের মাধ্যমেই পরিবর্তন শুরু করি, তাহলে এমন একদিন আসবে যেদিন সকল জনগণ সচেতন হবে এবং গণ-সচেতনতাই বাস্তুসংস্থানকে সংরক্ষণ করবে।

তথ্যসূত্র:

১ *আল-কুরআন*, সূরা বাকারা, ২:২৯। [বি.দ্র. এই প্রবন্ধে কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে *আল-কুরআনুল করীম*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৬৮) থেকে সকল উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য ও সূত্র উল্লেখ করার ক্ষেত্রে প্রথমে সূরা নং এবং পরে আয়াত নং উল্লেখ করা হয়েছে।]

২ Fazlun Khalid and Joanne O'Brien (eds.), *Islam and Ecology*, (London: Cassell Publishers, 1992).

৩ Anna M. Gade, *Muslim Environmentalisms: Religious and Social Foundations*, (New York: Columbia University Press, 2019).

৪ Richard Foltz, *Animals in Islamic Traditions and Muslim Cultures*, (Oxford: One World, 2006); Richard Foltz (ed.), *Environmentalism in the Muslim World*, (UK: Nova Science Pub Inc, 2005).

৫ Robert E. Ricklefs, *Ecology*, 2nd Edition, (United States of America: Chiron Press, 1979), p.11.

৬ *Merriam Webster's Collegiate Dictionary*, 10th Edition, (United States of America: G. & C. Merriam Co.1993).

৭ P.S. Verma & V.K. Agarwal, *Cell Biology, Genetics, Molecular Biology, Evolution and Ecology*, (New Delhi, India: S.Chan & Company Ltd, 2010), p.4.

৮ P.S. Verma & V.K. Agarwal, *Cell Biology, Genetics, Molecular Biology, Evolution and Ecology*, p.4.

৯ *Ibid*.

১০ Eugene P. Odum & Gary. W. Barrett, *Fundamentals of Ecology*, 5th Edition, Singapore: Thomson brooks/Cole, Thomson Asia Pte Ltd, 2004), p.1.

১১ *Ibid*, p.76.

১২ Terrestrial Ecosystem, online accessed in 01.11.2023.

১৩ Eugene P. Odum & Gary. W. Barrett, *op.cit.*, p.76.

১৪ পুকুরের বাস্তুসংস্থানঃ www.kalerkantho.com, 12.08.2018.

১৫ Aquarium, prothomkolkata.com, accessed in 01.11.2023.

১৬ জীবমণ্ডলের বিস্তৃতি উপরে নিচে ২০ কি.মি. ধরা হলেও মূলত অধিকাংশ জীবনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় হিমালয় পর্বতের শীর্ষ উচ্চতা থেকে ৫০০ মিটার নিচের সামুদ্রিক গভীরতার মধ্যেই। সমুদ্রতল থেকে ৮,৩৭২ মিটার নিচে পুয়ের্টোরিকা ট্রেঞ্চে মাছ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে পাখিরা সাধারণত ১,৮০০ মিটার উঁচুতে উড়তে পারে। রাপেল জাতীয় শকুন সমুদ্রতল থেকে ১১,৩০০ মিটার উঁচুতে উড়তে পারে। জীবমণ্ডলের যাবতীয় প্রাণিকুল ও উদ্ভিদকুল নিয়েই বাস্তুসংস্থান।

১৭ Eugene P. Odum & Gary. W. Barrett, *op.cit.*, p.22.

১৮ Familiarity with Animals-FWA, online accessed in 01.11.2023.

১৯ Eugene P. Odum & Gary. W. Barrett, *op.cit.*, p.22.

২০ Eugene P. Odum & Gary. W. Barrett, *op.cit.*, p.22.

২১ *আল-কুরআন*, সূরা মুমিনুন, ২৩:১২।

২২ *আল-কুরআন*, সূরা রহমান, ৫৫:১৪।

২৩ *আল-কুরআন*, সূরা রাদ, ১৩:৪।

২৪ *আল-কুরআন*, সূরা ইয়াসিন, ৩৬:৩৩।

২৫ *আল-কুরআন*, সূরা সিজদা, ৩২:২৭।

২৬ *আল-কুরআন*, সূরা হজ, ২২:৫-৬।

২৭ *আল-কুরআন*, সূরা আরাফ,৭:৫৮।

২৮ *আল-কুরআন*, সূরা আশ-শূআ'রা, ২৬:৭-৯।

২৯ *আল-কুরআন*, সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৩০।

৩০ *আল-কুরআন*, সূরা আন-নূর, ২৪:৪৫।

৩১ *আল-কুরআন*, সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬:৬৮-৭০।

৩২ *আল-কুরআন*, সূরা নাবা, ৭৮:১৪-১৬।

৩৩ *আল-কুরআন*, সূরা মুমিনুন, ২৩:১৮-১৯।

৩৪ *আল-কুরআন*, সূরা আবাসা, ৮০:২৪-৩২।

৩৫ *আল-কুরআন*, সূরা আন নাহল, ১৬:১০-১১।

৩৬ *আল-কুরআন*, সূরা ক্বাফ, ৫০:৯।

৩৭ *আল-কুরআন*, সূরা জুমার,৩৯:২১।

৩৮ *আল-কুরআন*, সূরা মুলক, ৬৭:৩০।

৩৯ *আল-কুরআন*, সূরা রূম,৩০:৪১।

৪০ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী (রহ.), *সুনানে ইবনে মাজাহ্* শরীফ, সকল খণ্ড একত্রে, (ঢাকা: বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন, ২০২১), হাদিস নং ৪২৫, পৃ. ১৫১।

৪১ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, প্রথম খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), হাদিস নং ২৩৮, পৃ. ১৩৮; ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআছ আস-সিজিস্তানী (রহ.), *আবু দাউদ শরীফ*, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২), হাদিস নং ৬৯, পৃ. ৩৬।

৪২ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ), *মুসলিম শরীফ*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), হাদিস নং ৫৪৬, পৃ. ৫৪; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্

আল-কাযবীনী (রহ.), *সুনানু ইবনে মাজাহ্*, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০), হাদিস নং ৩৪৩, পৃ. ১৬৩।

[৪৩] ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআছ আস-সিজিস্তানী (রহ.), *আবু দাউদ শরীফ*, প্রথম খণ্ড, হাদিস নং ২৬, পৃ. ১৪।

[৪৪] *আল-কুরআন*, সূরা ফাতির, ৩৫:৯।

[৪৫] *আল-কুরআন*, সূরা রূম,৩০:৪৮।

[৪৬] *আল-কুরআন*, সূরা আরাফ,৭:৫৭।

[৪৭] *আল-কুরআন*, সূরা ফুরকান, ২৫:৪৮-৪৯।

[৪৮] *আল-কুরআন*, সূরা হিজর, ১৫:২২।

[৪৯] *আল-কুরআন*, সূরা রূম,৩০:৪৬।

[৫০] *আল-কুরআন*, সূরা আশ্-শুরা, ৪২:৩৩।

[৫১] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী (রহ.), *সুনানু ইবনে মাজাহ্*, তৃতীয় খণ্ড, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২), হাদিস নং ৩৭২৭, পৃ. ৩৬৪।

[৫২] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, ৫ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), হাদিস নং ২৯৭৮, পৃ. ৩৬৪।

[৫৩] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, ৫ম খণ্ড, হাদিস নং ২৯৭৯, পৃ.৩৬৫; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী (রহ.), *সুনানু ইবনে মাজাহ্*, তৃতীয় খণ্ড, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২), হাদিস নং ৩৮৯১, পৃ. ৪৩২।

[৫৪] *আল-কুরআন*, সূরা মায়িদা, ৫:৩১।

[৫৫] *আল-কুরআন*, সূরা ক্বাফ, ৫০:৭-৮।

[৫৬] *আল-কুরআন*, সূরা আর-রহমান, ৫৫:৬।

[৫৭] *আল-কুরআন*, সূরা আনআম, ৬:৯৫।

[৫৮] *আল-কুরআন*, সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬:৬৩-৬৭।

[৫৯] *আল-কুরআন*, সূরা আনআম, ৬:৯৯।

[৬০] *আল-কুরআন*, সূরা আর-রহমান, ৫৫:১০-১৩।

[৬১] *আল-কুরআন*, সূরা মুমিনুন, ২৩:২০।

[৬২] *আল-কুরআন*, সূরা আনআম, ৬:১৪১।

[৬৩] *আল-কুরআন*, সূরা ইয়াসিন, ৩৬:৮০।

আল-কুরআন, সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬:৭১-৭৩।

[৬৫] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, নবম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), হাদিস নং ৫৫৮৭, পৃ. ৪০৮; ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ), *মুসলিম শরীফ*, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), হাদিস নং ৩৮২৭, পৃ. ৪৮৬।

[৬৬] ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআছ আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনান আবু দাউদ*, ষষ্ঠ খণ্ড, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১১), হাদিস নং ৫২৪১, পৃ. ৫৩৬।

[৬৭] ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআছ আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনান আবু দাউদ*, হাদিস নং ৫২৩৯, পৃ. ৫৩৫।

[৬৮] *আল-কুরআন*, সূরা আল-ইসরা (বনী ইসরাঈল), ১৭:৭০

[৬৯] *আল-কুরআন*, সূরা লোকমান, ৩১:১০।

৭০ *আল-কুরআন*, সূরা নাহল, ১৬:৭৯।

৭১ *আল-কুরআন*, সূরা আনকাবুত, ২৯:৬০।

৭২ *আল-কুরআন*, সূরা আনআম, ৬:৩৮।

৭৩ *আল-কুরআন*, সূরা গাফির (আল মুমিন), ৪০:৭৯-৮০।

৭৪ *আল-কুরআন*, সূরা ইয়াসিন, ৩৬: ৭১-৭৩।

৭৫ *আল-কুরআন*, সূরা জুখরুফ, ৪৩:১২-১৩।

৭৬ *আল-কুরআন*, সূরা নাহল, ১৬:৮০।

৭৭ *আল-কুরআন*, সূরা নাহল, ১৬:৫-৮।

৭৮ *আল-কুরআন*, সূরা নাহল, ১৬:৬৬।

৭৯ *আল-কুরআন*, সূরা মুমিনুন, ২৩:২১-২২।

৮০ *আল-কুরআন*, সূরা হজ, ২২:৩৬।

৮১ *আল-কুরআন*, সূরা নাহলঃ ১৬:৬৮-৬৯।

৮২ বিস্তারিত দেখুনঃ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, নবম খণ্ড, হাদিস নং ৫২৮২, পৃ. ২৬৩ ও হাদিস নং ৫৩০৭, পৃ. ২৭৬; ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ), *মুসলিম শরীফ*, ষষ্ঠ খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), হাদিস নং ৫৫৭৯, পৃ. ২৩০; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী (রহ.), *সুনানু ইবনে মাজাহ্*, প্রথম খণ্ড, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০), হাদিস নং ৩৪৩, পৃ.২৬৩।

৮৩ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ), *মুসলিম শরীফ*, সপ্তম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), হাদিস নং ৬৪৪০, পৃ. ১৩৯।

৮৪ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, চতুর্থ খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), হাদিস নং ২২০৭, পৃ. ১৯১ ও হাদিস নং ৫৫৮৪, পৃ. ৪০৭; ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ), *মুসলিম শরীফ*, ষষ্ঠ খণ্ড, হাদিস নং ৫৬৬৪, পৃ. ২৬১।

৮৫ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ), *মুসলিম শরীফ*, পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), হাদিস নং ৪৮৯৭, পৃ. ৪১৩।

৮৬ ইমাম আবু আবদুর রহমান আহমাদ আন- নাসা'ঈ (রহঃ), *সুনান আন-নাসাঈ*, হাদিস নং ৪৩৪৯।

৮৭ ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআছ আস-সিজিস্তানী (রহ.), *আবু দাউদ শরীফ*, তৃতীয় খণ্ড, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২), হাদিস নং ২৫৪০, পৃ. ৪৪৪।

৮৮ *আল-কুরআন*, সূরা হামীম সিজদা, ৪১: ১০।

৮৯ *আল-কুরআন*, সূরা নাজিয়াত, ৭৯:৩০-৩৩।

৯০ *আল-কুরআন*, সূরা লোকমান, ৩১: ১০।

৯১ *আল-কুরআন*, সূরা আল-আম্বিয়া, ২১: ৩১।

৯২ *আল-কুরআন*, সূরা আন নাহল, ১৬: ১৫।

৯৩ *আল-কুরআন*, সূরা রাদ, ১৩: ৩।

৯৪ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জীবনের কল্যাণ, *নয়া শতাব্দী*, ২৪ মে, ২০২২।

৯৫ *আল-কুরআন*, সূরা নাহল, ১৬: ১৪।

৯৬ *আল-কুরআন*, সূরা ফুরকান, ২৫: ৫৩।

৯৭ *আল-কুরআন*, সূরা আর-রহমান ৫৫: ১৯-২৫।

[৯৮] ইমাম আবু আবদুর রহমান আহমাদ আন- নাসা'ঈ (রহঃ), *সুনান আন-নাসাঈ*, প্রথম খণ্ড, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৩), হাদিস নং ৫৯, পৃ.৬৬।

[৯৯] Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat, UNESCO, WWW.UNESCO.ORG, accessed in 01.11.2023.

[১০০] Siddiqi, Akhtar, (1993), Islam and Ecology: By Fazlun Khalid and Joanne O'Brien (eds.), London: Cassell Publishers Ltd., 1992, 111 pp. *American Journal of Islam and Society*, 10(2), 254-256. https://doi.org/10.35632/ajis.v10i2.2513.

[১০১] Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences (IFEES), https://www.ifees.org.uk. Accessed in 01.11.2023.

[১০২] পরিবেশ নিয়ে ইসলামের ভাবনা, *বার্তা২৪*, ০৬ নভেম্বর, ২০২১।

[১০৩] পরিবেশ নিয়ে ইসলামের ভাবনা, *বার্তা২৪*, ০৬ নভেম্বর, ২০২১।

[১০৪] জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ পুনরুদ্ধারঃ বর্তমান প্রেক্ষাপট ও করণীয়, *Bangla bdnews24.com*, 5th June 2021.